থাকলেও এই নীতিতে পশ্চাদ্ অপসারণের চেষ্টাই প্রতিফলিত হয়েছে।

১৯৮৬ সালের ঘোষিত জাতীয় শিক্ষানীতি
National Education Policy, 1986

১৯৬৮ সালের ১৭ জুলাই স্বাধীন ভারতে প্রথম জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষিত হয়। তারপর ১৯৭৯ সালে ভারতে দ্বিতীয় দফা জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষিত হয়। ১৯৮৫ সালের ১৯শে আগষ্ট কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক নূতন শিক্ষানীতির জন্য 'Challenge of Education' বা 'শিক্ষার চ্যালেঞ্জ' নামে একটি দলিল প্রকাশ করেছেন। ১১৯ পৃষ্ঠার এই দলিলে মোট সাতটি বিভাগ আছে। ১৯৮৬ সালের জুলাই মাসের ২৩ ও ২৪ তারিখে রাজ্যশিক্ষা মন্ত্রকদের এক সম্মেলনে কেন্দ্রের নূতন শিক্ষানীতি ও দলিল সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

● **(১) প্রাথমিক শিক্ষা (Primary Education) :** দেশের সার্বিক উন্নয়নে সার্থকভাবে শিক্ষাকে প্রয়োগ করতে হলে ধাপে ধাপে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষাকে আবশ্যিক করতে হবে। সংবিধানে বলা হয়েছে, ১৪ বছর পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষার্থীর বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে রাষ্ট্রকে। কিন্তু এ লক্ষ্যে পৌছানোর চেষ্টার পরিবর্তে ক্রমশঃ শিক্ষায় পশ্চাদ গতি নিশ্চিত করা হচ্ছে। আদমসুমারির প্রতিবেদন অনুসারে ১৯৫১ সালে ভারতে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ছিল ৩০ কোটি, যা ১৯৮১ সালে ৪৪ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসাব অনুযায়ী ২০০০ সালে এই সংখ্যা প্রায় ৫০ কোটিতে পৌছাবে, যা সারা পৃথিবীর ১৫ থেকে ১৯ বছরের নিরক্ষরদের ৫৪.৮ শতাংশ হবে।

(সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা থেকে আমাদের দেশ এখনও বহু পিছিয়ে। যে দেশে আজও উপযুক্ত সংখ্যক বিদ্যালয়, শিক্ষক, শিক্ষা সরঞ্জাম ও সর্বনিম্ন স্বাস্থ্যসহায়ক পরিবেশের যথেষ্ট অভাব, শিশুশ্রম, অপুষ্টি ও অনাহারের লজ্জাজনক পরিস্থিতি বিদ্যমান, সেখানে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সবাই পাবে, কেবলমাত্র এই আশ্বাসটুকু ছাড়া সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, যা দেশ বিদেশের শিক্ষাবিদরাই প্রস্তাব করেছেন, তা করার পরিবর্তে প্রথামুক্ত প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তাব এই দলিলে রাখা হয়েছে। এ কেবল দায়িত্ব এড়িয়ে জনগণের বঞ্চনাকে আরও সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থারই প্রস্তাব। এটাও সকল দেশের শিক্ষাবিদ্দের দ্বারা স্বীকৃত যে, প্রথামুক্ত শিক্ষা প্রথাভুক্ত শিক্ষার পরিপূরক হলেও তা কখনই বিকল্প হতে পারে না। তা কেবল দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক তৈরী করার সহায়ক হবে।)

সারা বিশ্বে গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে জাতির সার্বিক বিকাশের স্বার্থে স্বীকৃত সার্বজনীন সাক্ষরতা নীতি থেকে ভারতকে সরিয়ে নিতে চাইছে দেশের শাসক শ্রেণী। তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন দলিলে এই বক্তব্য হাজির করা হয় যে, 'অনেক

দেশ মনে করে রাজনৈতিক নীতি নির্দ্ধারণে এবং জাতীয় পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সার্বজনীন সাক্ষরতা একটি জরুরী পূর্ব শর্ত। এই ধারণা ভারতের পক্ষে উপযুক্ত কিনা, তা ভালভাবে বিচার করে বরাবরের জন্য স্থির করে নিতে হবে।'

● **(২) মাধ্যমিক শিক্ষা (Secondary Education) ঃ** মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে - এই স্তরের শিক্ষার অপ্রয়োজনীয়। অবাঞ্ছিত প্রসার, শিক্ষকের ও শিক্ষা সরঞ্জাম ইত্যাদি অপ্রতুলতার জন্য মানের অবনয়ন ঘটেছে। একমাত্র প্রতি জেলায় একটি করে 'মডেল স্কুল' এই দুরবস্থার একমাত্র প্রতিষেধক।

ক) এই স্কুল গুলির উদ্দেশ্য হবে মেধা ও ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ, সমাজ চেতনা ও জাতীয় সংহতির বিকাশ, নমনীয় শিক্ষাশৈলীর প্রয়োগ ইত্যাদি।

খ) এই বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে সারা দেশের জন্য **N.C.E.R.T.** রচিত একটি মাত্র পাঠ্যক্রম।

গ) বিজ্ঞান, গণিত শিক্ষার মাধ্যম হবে ইংরাজী। সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যম হবে হিন্দী।

ঘ) অ-হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষা হবে যথাক্রমে ইংরাজী ও হিন্দী এবং আঞ্চলিক ভাষা হবে তৃতীয় ভাষা।

ঙ) বিশেষ ট্রেনিং - এর মাধ্যমে কর্মরত শিক্ষকদের একটা ক্ষুদ্র অংশকে 'বিশেষ গুণসম্পন্ন' করে নেওয়া হবে।

চ) এই বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র ভর্তির জন্য মানসিক অভীক্ষা ও প্রবণতা অভীক্ষা প্রয়োগ করা হবে।

ছ) এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জ্ঞানমূলক বিষয়ের সঙ্গে **মূল্যবোধ, মানসিকতা,** ব্যবহারিক জীবনযাত্রাও মূল্যায়িত হবে।

জ) কম্পিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করা হবে।

● **সমালোচনা ঃ** এই প্রকল্প শিক্ষা বিজ্ঞান বিরোধী, অগণতান্ত্রিক, জাতীয় সংহতির পরিপন্থী, এবং মুষ্টিমেয় কিছু ধনীর জন্যই শিক্ষার ব্যবস্থা এবং অগণিত জনগণকে শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত রাখার কৌশল মাত্র। কারণ, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাই শিক্ষাবিজ্ঞান সম্মত এবং সমগ্র জনগণের জন্য শিক্ষার সুযোগ প্রসারের একমাত্র উপায়। ১৯৩৭ সালে ইংরাজীর পরিবর্তে ভারতের মানুষ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার অধিকার সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যা অর্জন করেছে এবং আজও তা রক্ষা করে আসছে। ১৯৩৮ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস হরিপুরা সম্মেলনেও একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষার প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষানীতি সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় প্রস্তাব স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সুস্পষ্ট বিশ্বাসঘাতকতা যা ১৯৭২-৭৩ সালে শিক্ষা বিষয়ক খসড়াতেও শাসকশ্রেণী বলতে সাহস করেনি। এমন কোন দেশ পৃথিবীতে নেই, যে দেশ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থাকে বর্জন করে উন্নতি করেছে। এই প্রস্তাব মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে।

ভারতবর্ষ বহু জাতির ও সংস্কৃতির দেশ। এই সকল ভাষা, সংস্কৃতির বিকাশ তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা ভিন্ন জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার প্রস্তাব এক চূড়ান্ত ভন্ডামী মাত্র। সকল মানুষের জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাই একমাত্র জাতীয় ঐক্য ও সংহতি গড়ে তুলতে পারে। সকল সংস্কৃতির বিকাশকে রুদ্ধ করে কখনই জাতীয় সংহতি নিশ্চিত করা যাবে না - আরও বেশী বিচ্ছিন্নতার ক্ষেত্র তৈরী করা হবে।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এক ধরণের শিক্ষা কাঠামো ও পাঠ্যক্রম বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এক ধরণের অর্থ এক নয়। বিভিন্ন সংস্কৃতি ও জাতি গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করার মত নমনীয়তা এই পাঠ্যক্রমে থাকা চাই। তা না হলে সমগ্র পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীকে পরিবেশ থেকে কেবল আরও বিচ্ছিন্নই করবে না, তাকে সমাজের প্রতি উন্নাসিক করে গড়ে তুলবে। ইংলন্ডের "পাবলিক স্কুল" বা ভারতের "দুন স্কুল" কেবলমাত্র ধনীদের জন্যই নির্দিষ্ট। বাস্তবে ইংলন্ডের পাবলিক স্কুলের ছাত্ররাই দেশের ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার ও প্রশাসকদের প্রায় সমগ্র অংশ জুড়ে রয়েছে এবং দুন স্কুলের ছাত্ররা তো আমাদের দেশের প্রশাসনের মাথায় রয়েছে। মডেল স্কুলের লক্ষ্য ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, প্রশাসন, বিচার, সর্ববিভাগে কর্তৃত্ব যাতে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের থাকে। দেশ বিদেশের শিক্ষাবিজ্ঞানী, এমন কি কোঠারী কমিশনও "কমন স্কুল ব্যবস্থার " প্রস্তাবই করেছেন। কোঠারী কমিশনের ভাষায় " শিক্ষাকে সাধারণভাবে জাতীয় অগ্রগতি এবং নির্দিষ্টভাবে সামাজিক ও জাতীয় সংহতির শক্তিশালী মাধ্যম রূপে ব্যবহার করতে হলে এই পৃথকীকরণের অবসান প্রয়োজন। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আমরা 'পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিদ্যালয়ের ধারণা' চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব করছি। করের মাধ্যমে দেশের অগণিত মানুষের কাছ থেকে পাওয়া অর্থ দেশের মুষ্টিমেয় ধনীর দুলালদের জন্য ব্যয় করা হবে। ফলে সমগ্র জনগণের মধ্যে নতুন আর এক বিভেদের প্রাচীর গড়ে উঠবে। মডেল স্কুল বা Centres of excellence - গুলিতে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। আমরা চাই দেশের সমগ্র ছাত্রসমাজের শিক্ষার জন্য আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যাকে ব্যবহার করা হোক, মুষ্টিমেয় ধনীর দুলালদের জন্য নয়।

- **(৩) কারিগরী ও বৃত্তিশিক্ষা (Technical and Vocational Education) ঃ** দলিলের প্রস্তাবনায় কারিগরী বৃত্তি শিক্ষার বহুমুখী প্রসারের কথা বলা হয়েছে। দলিলে একদিকে পলিটেকনিক বিদ্যালয়গুলিতে আশাতীত ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি, অন্যদিকে হাতে কলমে কাজের প্রতি ছাত্রদের সামন্ততান্ত্রিক অনীহার এমন পরস্পর বিরোধী কথাও বলা হয়েছে। কেবল শিল্পের জন্য নয়, কৃষি যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রের উপযোগী কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে। ওতে কম্পিউটার প্রযুক্তি শিক্ষার কথাও আছে।

- **সমালোচনা ঃ** স্বাধীনতার উত্তর যুগে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে এবং শিক্ষা কমিশনগুলিতেও ব্যাপক ও বিশেষীকৃত কারিগরী শিক্ষা এবং উচ্চতর মাধ্যমিক

realme Shot on realme 9 5G 2023 08 18 13:17

স্তরে স্বয়ং সম্পূর্ণ বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। জনগণ ও যুব সমাজ আশা করেছিল যে, এই শিক্ষা তাদের জীবিকা সংগ্রহে সাহায্য করবে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। ১৯৮৩ সালের সরকারী হিসাব অনুযায়ী রেজিষ্ট্রীকৃত বেকার ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা ২৩০০০, বেকার ডাক্তারের সংখ্যা ১৮০০০ এবং বেকার কৃষিস্নাতকদের সংখ্যা ১৭০০০। সাধারণ স্নাতক ও অস্নাতকের কথা বাদই দিচ্ছি। আমাদের দেশে বছরে চাকুরী প্রার্থী সৃষ্টি হচ্ছে ১৮ লক্ষ এবং কাজ সৃষ্টি হচ্ছে ৮ লক্ষ। বেকারের সংখ্যা ১১ শতাংশ হারে বাড়ছে। কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অনগ্রসরতার দায়দায়িত্ব ছাত্রদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উপর চাপিয়ে দেওয়া হলেও মূল কারণটা অন্যত্র। ইউনিয়ন সরকারের পুঁজিগত তোষণনীতির ফলে ভূমি সংস্কার না করা, শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যাপক বাজার সৃষ্টি না করার ফলশ্রুতি হিসাবে শিল্পেও সামগ্রিক অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং চাকুরীর ক্ষেত্রে সংকোচন।

বাস্তবে ইউনিয়ন সরকার ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিকাশ ও জীবিকার ব্যাপক সম্প্রসারণের মধ্যে না গিয়ে, অর্থনেতিক সঙ্কটের মোকাবিলা করতে চাইছেন কম্পিউটার ,প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা ও তার প্রয়োগের মাধ্যমে, যা দেশের জীবিকার সম্ভাবনাকে আরও সংকুচিত করবে।

• **(৪) শিক্ষার চ্যালেঞ্জ ও নবোদয় বিদ্যালয় ঃ** স্বাধীনতা লাভের প্রায় একুশ বছর পরে ১৯৬৮ সালের ১৭ই জুলাই ভারতে প্রথম এবং ১৯৭৯ সালে দ্বিতীয় শিক্ষা নীতি ঘোষিত হয়। ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক ১৯৮৫ সালের ১৯ শে আগষ্ট বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার পর্যালোচনা ও পুনর্গঠন, শিক্ষার কার্যকারিতা ও গুণগত মান উন্নয়নের জন্য 'Challenge of Education' বা 'শিক্ষার চ্যালেঞ্জ' নামে একটি দলিল প্রকাশ করেছেন। ২৯ পৃষ্ঠার এই শিক্ষা দলিলে মোট সাতটি বিভাগ আছে। এই দলিলের মধ্যে বিবৃত আছে শিক্ষার একটি সামগ্রিক ছবি, ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ, নূতন যুগের ঊষালগ্নে (একুশ শতকে) দেশের শিক্ষানীতির লক্ষ্য। এই দলিলে এমন একটি অঙ্গীকার স্পন্দিত যা গতিশীল সমাজের মানুষকে মহত্তর উদ্দেশ্যে কর্তব্য কর্মে উদ্বুদ্ধ হবার কথা বলা হয়েছে। যেখানে সর্বস্তরের মানুষের শিক্ষার রাজ্যে প্রবেশের অধিকার থাকবে, শিক্ষার বিরামহীন ধারার সঙ্গে ও যুক্ত হতে পারবে।

'Challenge' অর্থাৎ শিক্ষার সংগ্রামী আহ্বান নামকরণ খুবই যুগোপযোগী। কারণ বর্তমান ভারত দেশের ভিতর ও বাইরে বিভিন্ন 'Challenge' এর সম্মুখীন। এই 'Challenge' এর সম্মুখীন হবার জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত করতে হবে, দীক্ষা নিতে হবে। এসবের ফলপ্রসূ পথ হল উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করা। দেশ এখন একুশ শতকে প্রবেশের মুখে। এখন যারা জন্মগ্রহণ করছে, তাদেরকে নূতন শতকে নিয়ে যাবার অঙ্গীকার, দায় দায়িত্ব আমাদের অর্থাৎ শিক্ষা পরিকল্পক, পরিচালক, প্রশাসক, শিক্ষক, অভিভাবক ও বুদ্ধিজীবী মানুষদের। গভীর বিশ্বাস, দৃঢ় প্রত্যয়, কঠোর শ্রম, শুভ আদর্শে, ত্যাগ ও ব্রতের মন্ত্র নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে একুশ শতকে প্রবেশের

realme 9 5G

দ্বারপ্রান্তে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের কাছে। ভবিষ্যৎ 'Challenge' এর মোকাবিলা করার জন্য তাদেরকে সুসজ্জিত করে তুলতে হবে। তবেই গড়ে উঠবে একটি গতিশীল প্রাণোচ্ছল সমাজ, সুসংহত জাতি ও কর্তব্যপরায়ণ নাগরিক।

একুশ শতকে প্রবেশগামী নাগরিকদের জন্য জাতীয় শিক্ষা নীতি পরিকাঠামোর একটি অন্যতম দিক হল জেলায় জেলায় মডেল স্কুল স্থাপন। প্রস্তাবিত মডেল স্কুলগুলির নুতন নামকরণ করা হয়েছে 'নবোদয় বিদ্যালয়' (Nabodaya Vidyalaya)।

(১) প্রস্তাবিত মডেল স্কুলে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা হবে একই সাথে হিন্দী ও ইংরাজী। আর অহিন্দী ভাষী এলাকাগুলিতে মাতৃভাষার মাধ্যম শিক্ষা দেওয়া হবে তৃতীয় ভাষা হিসাবে।

(২) এই মডেল স্কুলগুলি হবে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন পরিচালিত বিদ্যালয় গুলির আদর্শ অনুযায়ী।

(৩) এসব স্কুলে সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রদের গুণগত শিক্ষা (Qualitative Education) দেওয়া হবে।

(৪) ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব ছাত্রই মেধার ভিত্তিতে এসব স্কুলে ভর্তির সুযোগ পাবে। সমাজের অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্ররাও মেধার ভিত্তিতে এসব স্কুলে ভর্তি হতে পারবে।

(৫) এসব স্কুলে টেলিভিশন, টেপ - রেকর্ডার, ভিডিও, ক্যাসেট প্লেয়ার, ম্যাজিক ল্যান্টার্ন প্রভৃতি ব্যয় বহুল শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

(৬) এখন মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে জীবন ও পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হবে। এখানে তাদের সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকবে।

(৭) এই বিদ্যালয়গুলি আবাসিক হবে।

(৮) এই বিদ্যালয়গুলিতে সহশিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

(৯) এই বিদ্যালয়গুলির কার্যাবলী এমনভাবে পরিচালনা কারা হবে, যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সুষম বহুমুখী বিকাশ সাধন হয়।

(১০) এই বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশে এ ধরণের স্কুল পরীক্ষা-মূলকভাবে চালু করা হয়েছে।

● **সমালোচনা ঃ** মডেল স্কুল চালু করার প্রস্তাব ও তার ব্যবহার ইতিমধ্যে সারাদেশে প্রচন্ড বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। ১৯৮৬ সালের জুলাই মাসের ২৩ ও ২৪ তারিখে রাজ্য শিক্ষা মন্ত্রকদের এক সম্মেলনে কেন্দ্রের নুতন শিক্ষানীতি ও দলিল সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

(১) জাতীয় শিক্ষানীতির উপর শিক্ষাবিদরা কনভেনশনের মাধ্যমে বক্তব্য রেখেছেন যে এই শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষা জগতে এক বিরাট বৈষম্যের সৃষ্টি করবে,

জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী 'Elitism' - এর জন্ম দিবে। "Model School will create a band of loyal beaurocrats and would curtail the spread of Education among the masses."

(২) এই শিক্ষানীতির ফলে গরীব, সাধারণ মানুষের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে।

(৩) মুষ্টিমেয় কয়েকটি উচ্চমানের বিদ্যালয়ে মুষ্টিমেয় কিছু ছেলেমেয়ে উন্নত শিক্ষার সুযোগ পাবে আর দেশের অধিকাংশ ছেলেমেয়েরা নিকৃষ্ট স্কুলগুলিতে পড়বে।

(৪) যদিও বলা হয়েছে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকল ছেলেমেয়েই, মেধার ভিত্তিতে মডেল স্কুলে পড়ার সুযোগ পাবে, তাহলেও ব্যাপারটি পরিষ্কার নয়, কারণ কোন গরীব সন্তান মেধার জোরে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করলেও বিদ্যালয়ে ভর্তির খরচ, পড়ার উপরকণ সংগ্রহের ব্যয়, গ্রামের বাড়ী থেকে দূরবর্তী জেলা শহরে ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশুনা চালাবার ব্যয় সংগ্রহ করতে অক্ষম হবে।

(৫) গরীব বাবা-মা থাকা খাওয়া শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার চালাতে পারবে না। সরকার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে এমন কথাও বলা নেই।

(৬) কেবল মাত্র অবস্থাপন্ন বা ধনী সন্তানরা এই মডেল স্কুলে পড়বার সুযোগ ভোগ করবে।

(৭) প্রস্তাবিত মডেল স্কুল বলতে যদি প্রতি শ্রেণীর দুটি বিভাগে (৪০ + ৪০) = ৮০ জন পড়াশুনার সুযোগ পায় তবে আগ্রহী বাকী ছাত্ররা ঐ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।

(৮) মডেল স্কুলে পাঠরত ছাত্র এবং শিক্ষকদের সঙ্গে রাজ্যের অন্যান্য ছাত্র ও শিক্ষকদের একটা দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হবে।

(৯) সারা দেশে যে সমস্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে, সেগুলির গৃহ উন্নতমানের নয়।

(১০) সাজ - সরঞ্জামের অভাব শিক্ষোপকরণের অভাব, আগ্রহমুখী পুস্তক ও পাঠ্যপুস্তকের অভাব আছে।

● **উপসংহার ঃ** এরূপ হাজার হাজার রুগ্ন শুষ্ক বিদ্যালয়গুলির প্রতি যথোপযুক্ত সংস্কার ও উন্নতি বিধানের চেষ্টা না করে প্রতি জেলায় মডেল স্কুল স্থাপন যুক্তিযুক্ত নয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের অন্যতম প্রধান পরামর্শদাতা এবং তৎকালীন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মুনীশ রাজাও এই মডেল স্কুলের সমালোচনা করে বলেছেন – " এমন একটি পরিস্থিতি হয়েছে যেখানে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থায় অল্প - সংখ্যক কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসছে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ সংখ্যক উৎকৃষ্ট গুণবান ছেলেমেয়ে এবং বেশীর ভাগ কেন্দ্র থেকে বিপুল সংখ্যক নিকৃষ্ট শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেমেয়ে।"

মডেল হাইস্কুলের মত ব্লকস্তরে মডেল প্রাইমারী স্কুল গড়ার প্রস্তাব আলোচ্য দলিলে নেই, যা ১৯৭২ - ৭৩ সালে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শিক্ষা বিষয়ক খসড়ায়

Shot on realme 9 5G

ছিল। মডেল স্কুল মানসিকতা সৃষ্টির জন্য নতুন ধরণের শিক্ষক চাই। অতিরিক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রয়োজন নেই। কর্মরত শিক্ষকদের মধ্য থেকে অল্প সংখ্যক শিক্ষককে বাছাইকরে বিশেষ শিক্ষণের সাহায্যে "বিশেষ গুণসম্পন্ন" করা হবে। এই ট্রেনিং এর প্রথম ধাপ "মগজ ধোলাই" (Brain Storming)। মডেল হাই স্কুলে ইংরাজী ও হিন্দীর মাধ্যমে পড়ার ব্যবস্থার অর্থ হল প্রাথমিক স্তরেও ইংরাজী ও হিন্দী মাধ্যম বিদ্যালয় গ্রামে গঞ্জে গজিয়ে উঠবে অর্থাৎ দেশের শিক্ষাজগৎ সম্পূর্ণরূপে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়ে যাবে।

● **(৫) উচ্চ শিক্ষা ও নয়া শিক্ষানীতি ঃ** নয়া শিক্ষা নীতিতে শিক্ষার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, ভারতে উন্নতির পথে প্রবল বাধা নাকি ভারতব্যাপী অনুমোদিত কলেজগুলি। এদের দরুন উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সিলেবাসের আধুনিকীকরণ, শিক্ষা পদ্ধতির আধুনিকীকরণ কিছুই নাকি সম্ভব হচ্ছে না। তাই নয়া শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে এসব অনুমোদিত কলেজ তুলে দিতে হবে এবং তার বদলে স্থাপন করতে হবে Autonomous অর্থাৎ স্ব-শাসিত কলেজ। এই কলেজগুলি প্রত্যেকে কোন্ কোন্ বিষয় পড়াবে, তার পাঠ্যক্রমগুলি কি হবে, কি পদ্ধতিতে পড়ানো হবে, কি ভাবে পরীক্ষা নেওয়া হবে, ছাত্র কত হবে তার সবই নিজেরা স্থির করবে। এদের পরীক্ষান্তে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের ডিগ্রীও নিজেরাই দেবে। শুরুতে কেন্দ্রীয় সরকার এদের প্রত্যেককে একটা অনুদান মঞ্জুর করবে। কিন্তু তারপর নিজেদের চেষ্টায় এদের খরচ চালাতে হবে। টাকাও যোগাড় করতে হবে। এই কলেজগুলি যারা স্থাপন ও পরিচালনা করবে তারাই হবে সর্বেসর্বা। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, ছাত্রছাত্রীদের কোন নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকবে না। শিক্ষাকর্মীদের কাজের শর্তাবলী পরিচালকমন্ডলী তাদের ইচ্ছামত স্থির করবে।

বর্তমান ভারতে কলেজ আছে ৫২৪৬ টি এবং বিশ্ববিদ্যালয় ১৫০ টি। Challenge of education অনুযায়ী ১৩৭ টি। কলা বিদ্যায় ছাত্র ভর্তির হার কমেছে। কিন্তু বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি, কারিগরি এবং পেশা শিক্ষায় ভর্তির হার বেড়েছে। চিরাচরিত এবং প্রচলিত ধরণের কলেজ ও বিদ্যালয় আর স্থাপন করা হবে না। নতুন প্রতিষ্ঠানগুলি হবে কর্মমুখী, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পাবে শুধুমাত্র প্রতিভাবানরাই। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, উচ্চ শিক্ষাকে রাজনীতি মুক্ত করতে হবে, শিক্ষকদের আচরণ বিধি তৈরী করতে ও পালন করাতে হবে। কেবল গবেষণার জন্য অর্থ সাহায্য করা হবে। নিজের অর্থ ব্যয় করেই পড়াশুনা করতে হবে, ডিগ্রীকে চাকুরী থেকে বিযুক্ত করতে হবে।

চাকুরী থেকে ডিগ্রীকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। কারণ ডিগ্রীতে প্রকৃত শিক্ষা প্রতিফলিত হয় না। শিক্ষাকে কাজের সাথে সংযুক্ত করতে পারলে ডিগ্রীকে বিযুক্ত করতে কোন অসুবিধা নেই। কেবল মাত্র স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি, গবেষণা, আইন, ইঞ্জিনীয়ারিং, ডাক্তারী, অধ্যাপনা, ম্যানেজমেন্ট প্রভৃতি পেশার ক্ষেত্রে জ্ঞানের পরিচয় বাহক ডিগ্রী দরকার। কিন্তু চাকুরী ক্ষেত্রে ডিগ্রীকে অপ্রয়োজনীয় করতে হবে। ডিগ্রীর প্রতি যে

(৭) অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড (Operation Black - Board) :

জাতীয় শিক্ষানীতির অন্তর্গত অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড রূপায়ণ করতে গিয়ে দেখা গেছে, যে বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছিল, বাস্তবের সঙ্গে তার বিস্তর অমিল। আর এই ফারাকের জন্য দেশজুড়ে অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড কর্মসূচীর রূপায়ণ লক্ষ্যমাত্রার ধারে কাছেও পৌঁছতে পারবে না অন্তত চলিত আর্থিক বছরে, সরকারী রিপোর্টেই এই সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক সম্প্রতি জাতীয় শিক্ষা নীতির রূপায়ণের হাল সর্ম্পকে একটি অগ্রগতির রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। তা থেকে বোঝা যাচ্ছে, যে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড কর্মসূচী রচিত হয়। দেখা গেছে বাস্তবের সংঙ্গে তার যথেষ্ট অমিল। ধরে নেওয়া হয়েছিল দেশের বিভিন্ন রাজ্যের অনুন্নত এলাকাগুলিতে যে সব প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে, সেগুলির সামান্য কিছু সংস্কার করলেই এই কর্মসূচী রূপায়ণে কোন বাধা থাকবে না, এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে কেন্দ্রীয় প্রকল্প রচয়িতারা প্রতি জেলার ব্লকভিত্তিক স্কুলগুলির জন্য কি রকম খরচ হতে পারে তার একটা খসড়া তৈরী করেন। সেই খসড়া পাশে রেখে সমীক্ষার পর্বে দেখা যায় দেশের অনুন্নত এলাকাগুলিতেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব আছে নামেই। খাতায় কলমে স্কুল থাকলেও আদতে কিছুই যে নেই সেটাও ধরা পড়ে। ফলে দেখা যাচ্ছে , অপারেশন ব্লাকবোর্ডকে সার্থক রূপ দেওয়ার জন্য যে টাকার প্রয়োজন হবে বলে মনে করা হয়েছিল, তা বহুগুণ বাড়াতে হবে, বিশেষতঃ বিদ্যালয় ভবনের জন্য।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের এক অফিসার এই প্রসঙ্গে বলেন, এই সমস্যার ফলে চলতি বছরে বিভিন্ন রাজ্যের যেসব এলাকায় অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড কর্মসূচী রূপায়িত হবে বলে ধারণা করা হয়েছিল, তা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বছরে সারা দেশের ২০ শতাংশ ব্লক বা পুরসভা এলাকায় এই কর্মসূচী রূপায়ণ করা হবে

বলে লক্ষ্যমাত্রাও নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ঐ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা যাবে না। শুধুমাত্র এই বাবদ চলতি আর্থিক বছরে ১০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। ঐ টাকায় লক্ষ্যমাত্রার ৪০ শতাংশও পূরণ করা যাবে না বলে আশঙ্কা করা হয়েছে।

অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ডের জন্য ঠিক করা হয়, সব ঋতুর উপযোগী দুটি করে বড় মাপের ক্লাসঘর তৈরী করা হবে ৫০ হাজার টাকায়। ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য থাকবে দুটি হলঘর, দুটি ব্ল্যাকবোর্ড, মানচিত্র, নানা রকমের চার্ট, প্রয়োজনীয় বই, খেলনা ও খেলার সরঞ্জাম এবং একজন করে দ্বিতীয় শিক্ষক, যিনি মহিলা হলেও খুবই ভাল হয়। ঠিক হয়েছিল, এই জিনিষগুলি মাথায় রেখে এ বছরে দেশের ২০ শতাংশ, আগামী বছরে ৩০ শতাংশ এবং ৮৯-৯০ সালে বাকী ৫০ শতাংশ পরিকল্পনার সম্পূর্ণ রূপায়ণ করে ফেলা সম্ভব হবে। এই কর্মসূচীর কতকগুলি দিক আছে, যথা - সামাজিক, বস্তুগত ও মনোভাবের। শিক্ষার্থীর মধ্যে উপযুক্ত মনোভাবের সৃষ্টি করতে হবে। এটি প্রতিফলিত হবে সামাজিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে এ উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য – "This Operation Black board is not just a structure that is around the child, it is something that we have to build into the mind of the child, so that the child in later stages of his life carries into the rest of society."

রূপায়ণের আগে বিভিন্ন রাজ্যে বেছে নেওয়া এলাকা ভিত্তিক প্রজেক্ট রিপোর্ট খতিয়ে দেখার পর বোঝা যায়, প্রতিটি অঞ্চল দারুণভাবে অনুন্নত এবং সেসব এলাকাতে বিদ্যালয়ের কোন অস্তিত্বই স্বাধীনতার এত বছর পরেও গড়ে তোলা হয়নি।

প্রকল্প রূপায়ণে কত খরচ হবে, তার হিসাবও ওই রিপোর্টে দেওয়া হয়েছে, যা সরকারী হিসাবের কয়েকগুণ বেশী। এই বর্ধিত হিসাব প্রধানতঃ বিদ্যালয়ভবন তৈরীর ক্ষেত্রে। এমন তথ্যের প্রমাণও পাওয়া গেছে। যাতে দেখা যায়, খাতায় কলমে স্কুল থাকলেও বাস্তবে কোন অস্তিত্ব নেই। শিক্ষকের নাম থাকা সত্বেও তার হদিশ পাওয়া যায় নি। ফলে দেখা গেছে, সরকারী হিসাবে স্কুল প্রতি যত খরচ হবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল, প্রকল্প রূপায়ণ করতে গেলে তার কয়েকগুণ বেশী খরচ করতে হবে। ফলে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক মনে করেছেন, চলতি বছরে যতগুলি ব্লকে 'অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড' এর রূপায়ণ করা হবে বলে মনে করা হয়েছিল, তা সম্ভব হবে না।

ফলে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সম্ভব নয়। শিক্ষামন্ত্রকের এক অফিসার এ প্রসঙ্গে বলেন, কেন্দ্রীয় লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার একটি উপায় অবশ্য রয়েছে। সেটি হল, প্রকল্প রূপায়ণের জন্য যেসব ব্লক রাজ্যসরকারগুলি চিহ্নিত করেছিলেন সেগুলি বাদ দিয়ে কিছুটা উন্নত এলাকায় এই স্কুল তৈরী করা। কিন্তু অধিকাংশ রাজ্যেই সব থেকে অনুন্নত এলাকাগুলিতে চলতি বছরের জন্য বেছে নিয়েছে।

● **(৮) ডিগ্রীকে চাকুরী থেকে বিযুক্তিকরণ (Delinking degree from jobs) ঃ** নয়া শিক্ষা নীতিতে ডিগ্রীকে চাকুরী থেকে বিচ্ছিন্ন করার কথা

বলা হয়েছে। কারণ ডিগ্রীতে প্রকৃত শিক্ষা প্রতিফলিত হয় না। ডিগ্রী পেলেই সাফল্যের স্বর্ণপথ উন্মোচিত হয় না। যদি শিক্ষাকে কর্মের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায়, তাহলে ডিগ্রীকে বিচ্ছিন্ন করতে অসুবিধা হবে না। কাজের বিভিন্ন দিক খুলে দিলে উচ্চশিক্ষার উপর চাপ কমবে। তখন ডিগ্রীর মোহ কমে যাবে। কারণ ডিগ্রীর চাহিদা থাকার জন্য কলেজে ভর্তির বেলাতেও খুব ভীড় হয়। কেবলমাত্র অধ্যাপনা, গবেষণা, ইঞ্জিনীয়ারিং, চিকিৎসাবিদ্যা, আইন, ম্যানেজমেন্ট প্রভৃতি ক্ষেত্রে উচ্চ ডিগ্রী লাভ দরকার। চাকুরীর ক্ষেত্রে ডিগ্রী অপ্রয়োজনীয়। তবে কর্মক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়োগকর্তাগণ বিশেষ বিশেষ অভীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষা করতে পারবেন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কর্মকর্তাগণ ট্রেনিং দিবার ব্যবস্থা করতে পারেন। ডিগ্রীর প্রতি সকলের যে একটা মোহ আছে তার বিরুদ্ধে মানসিকতা তৈরী করতে হবে। ডিগ্রীর প্রতি মোহ কমাতে পারলে পরীক্ষায় ব্যর্থতাজনিত অপচয়ও কমবে। জাতীয় স্তরে Standard Test- এর ব্যবস্থা করে কোন্ কাজের জন্য কে উপযুক্ত তা নির্ধারণ করতে হবে।

- **(৯) চূড়ান্ত পরীক্ষা বাতিল ঃ** পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে মাধ্যমিক, হায়ার সেকেন্ডারী ও স্নাতক পর্যায়ে চূড়ান্ত পরীক্ষা তুলে দেওয়া হবে। বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে শিক্ষার সর্বপর্যায়ে চূড়ান্ত পরীক্ষা তুলে দিয়ে কেবলমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করা যায় না। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, যে অধ্যাপকরা ছাত্রদের পড়াচ্ছেন, তাঁরাই পরীক্ষা নেবেন। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত কোন পরীক্ষার বালাই থাকবে না।

- **(১০) শিক্ষক শিক্ষণ ঃ** শিক্ষক শিক্ষণ প্রসঙ্গে Challenge of Education-এ বলা হয়েছে চালু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন মূল্য নেই। তাই প্রতি রাজ্যে রাজ্যে এই শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় National Council of Teacher Education গঠিত হবে।

- **(১১) সংহতিকরণ ঃ** এই দলিলে শিক্ষাক্ষেত্রে সংহতি করণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যেসব প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলিকে আরও সংহত করে তোলা হবে মাত্র।

- **(১২) নন্‌ফর্মাল ঃ** যে সমস্ত শিশু সাবেকী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে তাদের জন্য ফর্মাল শিক্ষার কথা এই দলিলে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু এর জন্য যে প্রচুর অর্থ দরকার, তার প্রতিকারের কথা এই দলিলে উল্লিখিত হয় নি।

- **(১৩) ভাষা ঃ** শিক্ষায় ভাষা সম্পর্কে একটি নুতন ফর্মুলা দেওয়া হয়েছে। অহিন্দী ভাষী রাজ্যগুলিতে হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া হবে।

- **(১৪) মুক্ত বিদ্যালয় ও দূরায়ত শিক্ষা (Open School, Distance learning)ঃ** কোন নতুন প্রতিষ্ঠান পারতপক্ষে আর কিছুতেই খোলা হবে না। কেবল মুক্ত বিদ্যালয় ও দূরায়ত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হবে। দূরায়ত শিক্ষা মানে

Correspondence course, টি. ভি, টেপ রেকর্ডার, ভিডিও - এর মাধ্যমে
শিক্ষা দেওয়া হবে। তবে রেডিও, টেলিভিশনের প্রোগ্রামে গণশিক্ষার সহায়ক বস্তুর
পূর্ণ দেওয়া এখনও সম্ভব হয়নি।